# একক ৫০ ❐ কাজী নজরুল ইসলাম ঃ তিনটি কবিতা

গঠন

৫০.১ উদ্দেশ্য

৫০.২ প্রস্তাবনা

৫০.৩ নজরুল ইসলাম ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য কথা

৫০.৪ মূলপাঠ—১ নারী (সর্বহারা)

৫০.৫ সারাংশ—১

৫০.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

৫০.৭ মূলপাঠ—২ ঃ দারিদ্র্য (সিন্ধু হিল্লোল)

৫০.৮ সারাংশ—২

৫০.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

৫০.১০ মূলপাঠ—৩ ঃ গানের আঁড়াল (চক্রবাক)

৫০.১১ সারাংশ—৩

৫০.১২ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

৫০.১৩ উত্তরমালা

৫০.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

## ৫০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র অনুরক্ত অথচ স্বাতন্ত্র্য সন্ধানী কবিদের অন্যতম কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে নজরুলের সমকাল ও তাঁর কবিমানস সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারবেন। নজরুলের কাব্যজীবনের শুরু হয় ১৯১৯ সালে আর শেষ হয় ১৯৪২-এ। যদিও তার পরেও তিনি জীবিত ছিলেন, কিন্তু কাব্য বা কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সে সময় সম্ভব ছিল না। সুতরাং বলা যায় প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে তাঁর কাব্যচর্চার আরম্ভ আর তার শেষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে। এই এককটি পড়ে এই দেশ ও কালের প্রেক্ষাপটে যে সমস্যা ও শংকা দেখা দিয়েছিল, নজরুলের কবিতা তারই পরিণত ফল—এটি বুঝতে পারবেন।

এইসব ধারণা, বোঝা ও পড়া থেকে যে জ্ঞান আহরণ করবেন, সেটি থেকে প্রয়োজনে পরে প্রাসঙ্গিক আলোচনা বা সমালোচনা করতে পারবেন।

- নজরুলের কাল ও কবিমানস সম্পর্কে ধারণা।
- নজরুলের তিনটি কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচয়।
- নজরুল সম্পর্কে প্রয়োজনে আলোচনা ও সমালোচনা করতে পারবেন।

## ৫০.২ প্রস্তাবনা

বাংলা কাব্যে আধুনিকতা ঃ ২০ শতক পর্যায়ে এ সময়ের রাজনৈতিক সমাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমিকায় তার যুগ লক্ষণ ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্বের শেষে কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে তাঁর কাব্য রচনা করলেও (তাঁর নিজস্ব কাব্য ধর্ম সূত্রে) তিনি রবীন্দ্র-উত্তর কবি হিসেবে চিহ্নিত।

উনিশ শতকে ঘটে গেছে বাংলার নবজাগরণ, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, স্বদেশি, অসহযোগ, সত্যাগ্রহের মতো নানা ঘটনা। দেশের জনমানসে স্বাধীনতার স্পৃহা। ইংরেজি শিক্ষার আনুষাঙ্গাক ফল একদিকে যেমন বিশ্বকে চিনতে শিখিয়েছে, আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে, অপরদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার, ব্যাপক পণ্য-উৎপাদনের জন্য কলকারখানা স্থাপনের সঙ্গে যুক্ত সীমাহীন শোষণের ফলে প্রতিবাদী কণ্ঠ ভিন্নতর পথে সংগঠিত হয়েছে। নব্য শিক্ষিত বাঙালি ইংরেজি শিক্ষার গুণে, মেকলের নির্দিষ্ট পথ অর্থাৎ চাকুরি ছাড়া আর কোনো কাজকেই কাজ মনে করছে না। ফলে বেকারি জন্ম ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ বাড়ছে। এমনই সময় এসেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪—১৯১৮)। এর ফলে সামাজিক-অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ভারসাম্য আরও বিপর্যস্ত হয়েছে। যুদ্ধান্তে আংশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি, মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে এক ধরনের রাজনৈতিক হতাশা জালিয়ানওয়ালাবাগের সমাবেশ ঘটেছিল, সেই নৃশংস হত্যালীলায় উদ্ধত শাসকশক্তির হটকারী আচরণে, দেশ জোড়া মানুষ বিশ্বাসঘাতকদের আচরণে হতচকিত হয়ে পড়ে। এ সময় থাকেই শিক্ষিত বাঙালির চেতনায় বিক্ষোভ উদ্দাম হয়ে ওঠে। শিক্ষিত যুবকের জীবনের সমস্যা যত বেড়েছে, ততই দৃঢ় হয়েছে শাসক ইংরেজের প্রতি অভিশ্বাস। শতগুণে বেড়েছে তার পরাধীনতার গ্লানি। প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দা তার জীবন আরও জটিল ও আবর্ত সংকুল করেছে। ফলত তরুণ মনে যেমন অবিশ্বাস, হতাশা জাগে, তেমনই সমস্ত প্রচলিত ও প্রথাগত ধারণা ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে। এ সবই সমকালীন কবিদের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর আধুনিক কবিতার ভূমিকায় এই যুগ লক্ষণকে ব্যাখ্যা করেছেন —"একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের।" আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানের নতুনতর আলোকদীপ্তি। ১৯১৭-র সোভিয়েত বিপ্লব নতুন সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে। এতদিন রাজা- বাদশা, জমিদার, বিত্তবান, মধ্যবিত্ত মানুষকে নিয়ে সাহিত্য বৃত্তের চলন ছিল, তারই মধ্যে বিপ্লবের নতুন আলো নতুন জগৎকে প্রতিষ্ঠিত করল। আবহমান কাল থেকে সাহিত্যে গ্রামবাংলার কৃষক-শ্রমিক ক্বচিৎ স্থান পেলেও প্রাণমন জুড়ে কোনো সময়েই সে প্রাধান্য বিস্তার করেনি —তাঁরা তাঁদের বৃহৎ জীবন স্পন্দন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সুচিহ্নিত ও স্বতন্ত্র রূপে দেখা দিল। এরই ফলে ঘটল হয়তো বুদ্ধদেব যাকে বলেছেন, 'বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি।'

বাংলাকাব্যে নতুন মূল্যবোধ ও কাব্যচেতনার সূচনা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) ও মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮০-১৯৫২)।

**সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত**—বুদ্ধদেব বসুর মতে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যে তিনিই প্রথম মৌলিক কবি। সত্যেন্দ্রনাথ শিল্পী হিসেবে বেশ শক্তিশালী, বৈচিত্র্যের সাধনায় নানা দিক থেকে অনন্য। তিনি রবীন্দ্রপ্রীতির জন্য খ্যাত হলেও, বিবিধ বিষয় ও ছন্দ নিয়ে নূতন নূতন পরীক্ষা ও তাতে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'চরকার গান', 'পালকির গান', 'ঝরনার গান' ইত্যাদি বিষয়ের দিক থেকে যেমন তেমনি ছন্দ ও রূপবন্ধেও অভিনব। ফলে তাঁর কল্পনা ও প্রকাশ—দুইই বিচিত্রসঞ্চারী। সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানসে যে একটি রোমান্টিক

সৌন্দর্যলিপ্সা ছিল, তা তাঁর কবিতার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ছত্রসজ্জায় ধরা পড়ে, কিন্তু সেটি অনেক সময়ই চাপা পড়েছে তার চেষ্টাকৃত তথ্য ও জ্ঞানবৈভব প্রদর্শন ও ছন্দোসৌকর্যের সচেতন চর্চায়। তিনি সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন ও সাময়িক ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু কবিতা রচনা ছাড়াও বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করতে প্রচুর দেশি-বিদেশি কবিতা অনুবাদ করেছেন। এসব রচনার মধ্যে অন্যতর স্বাদ পাওয়া গেলেও, গুণগত মান সর্বত্র উল্লেখযোগ্য নয়। অনুবাদ ভাবানুবাদ অনেকক্ষেত্রেই মূলের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়নি। দেশপ্রীতিমূলক কবিতায় উচ্ছ্বাস থাকলেও, ভাব-গভীরতা ছিল না। অতীত গৌরবের প্রশস্তি থাকলেও, দেশের সমস্যার গভীরে প্রবেশ করবার ক্ষমতা ছিল না। রচনাগুলি তাই ক্ষেত্রবিশেষে কবির কলমে লেখা না হয়ে অগভীর সাংবাদিক সুলভ পদ্যরচনায় পরিণতি পেয়েছে। বস্তুত "কবিতা যখন প্রকাশের বেদনায় কম্পমান, আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ, সেখানেই সত্যেন্দ্রনাথের চির নির্বাসন।" কবির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ঃ 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬), 'তীর্থসলিল' (১৯০৮—অনুবাদ), 'তীর্থরেণু' (১৯১০—অনুবাদ), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২) প্রভৃতি।

যতীন্দ্রনাথ বৃত্তিতে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। জেলা বোর্ডে কর্মসূত্রে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়েছে। গ্রামের শস্য শ্যামলতার মধ্যেও অগণিত মানুষের নীরন্ধ্র দারিদ্র্য, হতচ্ছড়া কৃশ মূর্তি তাঁর অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করেছে। রবীন্দ্রকাব্যে অনুরক্ত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর মধ্যে তিনি এই বাস্তবের সন্ধান পাননি। এ সময় তরুণ কবিরা যখন আত্মবদ্ধ কল্পনায় রবীন্দ্রপ্রভাব নির্গমের পথ খুঁজছিলেন তখন যতীন্দ্রনাথের দেশ ও জগৎ, তাঁর কবিতার খেদ-পরিতাপ ও নৈরাশ্য তাঁকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। বস্তুজগৎ, তাঁর রোমান্টিক অনুভূতিকে আড়াল করে বস্তুতন্ত্রকেই প্রাধান্য দিয়েছে। তাঁর মরুকাব্যত্রয়ী—'মরীচিকা' (১৯২৩), 'মরুশিখা' (১৯২৭) এবং 'মরুমায়া' (১৯৩০) বাংলার শ্যামল আবহাওয়ার ঊষর, রুক্ষ নৈরাশ্যের ছবি নিয়ে এসেছে। তিনি ব্যঙ্গে, তীক্ষ্ণ শ্লেষে, কাব্যের প্রচলিত আদর্শবাদ ও সৌন্দর্যবোধকে তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে নিপুণ যুক্তি শৃঙ্খলায় আক্রমণ করেছেন। সমস্ত মোহজাল, এমন কী মঙ্গালময় ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রচলিত সাধারণ প্রত্যয়কেও তিনি বর্জন করেছেন, বলেছেন ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ বা সুবিচারক নন, তিনি মঙ্গালময়ও নন ; বরং এক ছদ্মবেশী নিষ্ঠুর সত্তা যিনি তাঁর সৃষ্ট জীবদের সুখদুঃখে শুধু উদাসীন থাকেন না, তাদের দুঃখের ভার বৃদ্ধিতেই যেন বেশি সচেষ্ট থাকেন।

তাঁর কবিতার কলাকর্মেও এই নেতিবাদ শব্দ, চিত্রকল্প ও ছন্দপ্রকরণে ফুটে উঠেছে। কিন্তু পরিণত প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে কবির 'সায়ম্', 'ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা'-য় বিপরীতে সুর বেজেছে। এর আভাস অবশ্য প্রথম পর্বে তাঁর মনের গভীরে মানুষ সম্পর্কে যে প্রত্যয় ছিল তা থেকেই, অর্থাৎ মানুষের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের বেদনা থেকেই এসেছে মনে হয়। তাই শেষ পর্বের কবিতায় সন্ধ্যার রক্তিম দিগন্তে প্রতিবাদ নয়, অনুতাপম্লান বিশ্বাসে করুণার যে সুর বেজেছে তা কবির রবীন্দ্রঅনুরক্তির আভাস নির্মাণ করে। এদিক থেকে যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র অনুরাগী হয়েও স্বতন্ত্র কবিপ্রতিভায় ভাস্বর হয়ে আছেন।

প্রথম জীবনে মোহিতলালও রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন, তাঁর 'স্বপনবসারী' সে সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর কবিমানসের স্বাতন্ত্র্য ভোগকামনায়, দেহবাদে। প্রেম ও সৌন্দর্যের উপাসক রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ঋষির মতোই ধ্যানী, উদাসীন। মোহিতলালের কবিতায় যেখানে উগ্র দেহাত্মবাদ, তীব্র যৌবন কামনা ও সম্ভোগ পিপাসা মুখ্য, সেখানে রবীন্দ্রনাথে দেহোত্তরণের আকাঙ্ক্ষাই প্রধান। মোহিতলালের কবিতার কাব্যনির্মিতি অনেকটা মধুসূদনের, শৈলীর স্মারক, ক্ল্যাসিক্যাল বা ঐতিহ্যপন্থী। সেখানে কোথাও শিথিলতার অবকাশ নেই। ছত্র, স্তবকবিন্যাসে একটি সদাসচেতন কবিমনের পরিচয় আছে।

মোহিতলালের মনোভঙ্গিতে লঘুতার কোনো স্থান নেই। তিনি সততই গুরুগম্ভীর মনন-কল্পনার বর্মে ক্লাসিক্যাল সংযম, বাহুল্যবর্জিত উপস্থাপনার পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে 'সনেট' রচনায় মোহিতলাল বিশেষ সফল। সনেটেরে পদবিন্যাসে তিনি দক্ষ শিল্পী। কবির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ, 'স্বপনপসারী' (১৯২২), 'বিস্মরণী' (১৯২৭), 'স্মরগরল' (১৯৩৬), 'হেমন্ত গোধূলি' (১৯৪১), 'ছন্দ চতুর্দশী (১৯৫১)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯—১৯৭৬) আবির্ভাব। কবি খ্যাতিতে এ সময়ের কবিকুলে নজরুল সর্বাতিক্রমী। তিনি অনেকটা স্বভাবকবি ছিলেন। প্রাণের একান্ত আবেগের তাড়নায়, নিজেকে প্রকাশের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সেই স্বতঃস্ফূর্ত সূত্রেই তাঁর কবিতা ও গান রচিত হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই তা নতুন বক্তব্য, ও সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যে অনন্য। আলোচ্য কবিতা ত্রয়ীতে তার আংশিক পরিচয় পাওয়া যাবে।

## ৫০.৩ কাজী নজরুল ইসলাম ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ ; ২৪শে মে ১৮৯৯ বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে। বাবা কাজী ফকির আহমদ ও মা জাহেদা খাতুন। শৈশবেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। দশ বছর বয়সে তিনি গ্রামের মক্তব থেকে প্রাথমিক পরীক্ষা দেন। সংসারের চাপে সেখানে একবছর শিক্ষকতার সঙ্গে মোল্লাগিরিও করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথমে শিয়ারসোল হাই স্কুল ও পরে মাথরুন স্কুলে ভর্তি হন, পরের বছর পড়াশুনা ছেড়ে লেটো ও কবি দলে যোগ দেন। দারিদ্র্যের চাপে ১৯১৬তে প্রথমে বাবুর্চির ও পরে রুটির দোকানে কাজ নেন। মাঝের এক বছর ময়মনসিংহের একটি স্কুলে পড়ে, বাৎসরিক পরীক্ষার পর ১৯১৫ শিয়ারসোল রাজ স্কুলে ভর্তি হন। এক্ষণে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (সাহিত্যিক)-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় এবং বিপ্লবী শিক্ষক নিবারণ চন্দ্র ঘটকের সান্নিধ্যে তাঁর প্রাণে বিপ্লবী চিন্তাধারার সঞ্চার হয়। এখান থেকেই তিনি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ৪৯নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে প্রথমে লাহোর হয়ে নৌসেরাতে প্রশিক্ষণ শেষে করাচি সেনানিবাসে যান।

কৈশোরে কিছু গান বা রচনা থাকলেও, নজরুলের যথার্থ সাহিত্য রচনার সূচনা করাচির সেনানিবাসে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সেখানে লেখা প্রথম গল্প 'বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী' (সত্তগাত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫), প্রথম কবিতা 'মুক্তি' (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৬) এবং প্রথম প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' (সওগাত, কার্তিক ১৩২৬)-এ প্রকাশিত হয়। মার্চ ১৯২০ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়ায় কর্মহীন নজরুল কলকাতায় ফিরে শৈলজানন্দের মেসে আশ্রয় নিলে, সেখানে তাঁর ধর্মমত অন্তরায় হওয়ায় ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে মুজফর আহমেদের সঙ্গে বাস করতে শুরু করেন। এপ্রিলে একবার চুরুলিয়া যান। এ সময় কবির কিছু রচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়, কিন্তু খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছান সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে (৬ই জানুয়ারি, ১৯২২) 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে।

ইতোমধ্যে জীবিকার তাগিদে অস্থিরচিত্ত নজরুলকে কয়েকটি কাগজে কাজ করতে দেখা যায়। ১২ জুলাই, ১৯২০ দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় ৬০ টাকা বেতনে কাজ নেন, ওই বছরই ডিসেম্বরে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সঙ্গে ১০০ টাকার বিনিময়ে লিখতে চুক্তিবদ্ধ হন। ১৯২১ ফেব্রুয়ারিতে আবার 'নবযুগে' যোগ দিলেও মার্চ-এ ইস্তফা দেন। ১৯২২ জুন এ 'দৈনিক সেবক' কাগজে ১০০্ টাকা বেতনে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে রচিত সম্পাদকীয় লেখা নিয়ে মতবিরোধ হলে সে কাজ ছেড়ে দেন। ১১ই আগস্ট নিজেই সপ্তাহে দুবার প্রকাশে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'ধূমকেতু' কবিতা নিয়ে 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখানেই পূজা সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে'

কবিতা ও অক্টোবরে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে 'ধূমকেতুর পথ' সম্পাদকীয় লেখেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে নভেম্বরে নজরুলের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়, আর ২৩শে নভেম্বর তিনি কুমিল্লায় গ্রেপ্তার হন। কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্ট হয়ে ১৭ই জানুয়ারি ১৯২৩ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রেরিত হন। এ সময় স্নেহভাজন নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকটি উৎসর্গ করেন। হুগলি জেলে, জেল কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে ৩৯ দিন অনশন করার পরে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে তাঁকে বহরমপুর জেলে বদলি করা হয়। সেখান থেকে এক বছর তিন সপ্তাহ পরে মুক্তি পান। ১৯২৪, ২৪শে এপ্রিল কলকাতায় প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গে বিবাহ। ওই বছর অক্টোবরে 'বিষের বাঁশি' কাব্যগ্রন্থ নিষিদ্ধ এবং নভেম্বরে 'ভাঙার গান' বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯২৫ মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে কবির ফরিদপুর কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে সাক্ষাৎ ঘটে। নভেম্বরে 'শ্রমিক কৃষক প্রজা পার্টির ইস্তাহার এবং ডিসেম্বরে তাঁর লাঙল' পত্রিকায় 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ করেন। ১৯২৬ এ নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মেলনে 'শ্রমিকের গান', ছাত্র-যুবা সম্মেলনে 'ছাত্রদলের গান' রচনা করেন ও গেয়ে শোনান। ১৯২৭-এ মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম ও ১৯২৮-এ দ্বিতীয় সম্মেলন উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয় সম্লেন উপলক্ষে 'চল চল চল' গানটি রচিত হয়। ১৯২৯-এ জাতির পক্ষে কবিকে সংবর্ধিত করা হ। ১৯৩০-এ কাব্যগ্রন্থ 'প্রলয় শিখা', 'চন্দ্রবিন্দু' যথাক্রমে বাজেয়াপ্ত হয়ে নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে। এই বছরই ২৫শে নভেম্বর কবির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে ৬ই নভেম্বর গ্রেপ্তার ও ১১ ডিসেম্বর কারাদন্ড দেওয়া হয়।

এদিকে ১৯২২, ১০ই নভেম্বর 'ধূমকেতু' ১ম বর্ষের ২১শে সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে গেলে, কবি 'নওরোজ' (১৯২৭) পত্রিকায় স্বল্পকালের জন্য যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪০-এ ফজলুল হক তাঁর দলের মুখপাত্ররূপে নবপর্যায়ের 'দৈনিক নবযুগ' প্রকাশ করলে নজরুল প্রধান সম্পাদক পদে যোগ দেন। ১৯৪১ কলকাতায় সমারোহসহকারে নজরুল জন্মোৎসব পালন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে নজরুল কলকাতা বেতার কেন্দ্রে 'রবিহারা' কবিতা আবৃত্তি করেন। ১৯৪২, ১০ই জুলাই নজরুল আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কবিপ-ী প্রমীলা ১৯৪০ সালেই পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রথমে লুম্বিনী পার্ক ও রাঁচিতে চিকিৎসার পরে 'নজরুল নিরাময় সমিতি' এবং পূর্ব বাংলা ও পাকিস্তান সরকারের আনুকূল্যে ছয় মাস লন্ডনে, পরে ভিয়েনায় চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু কোনো চিকিৎসাতেই তাঁর চেতনা ও সৃষ্টিশক্তি ফিরে আসেনি। ১৯৭১ বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে নজরুল ঢাকায় যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট ; বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সাহিত্য পুরস্কার '২১শে পদক' ইত্যাদিতে তিনি সম্মানিত হন। ২৭শে আগস্ট ১৯৭৬ তারিখে ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে ২৯শে কবির জীবনাবসান হয়।

**কাব্যকথা ঃ** নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' ১৩২৯ সালের কার্তিক (অক্টোবর, ১৯২২) প্রকাশিত হয়। বইটি বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এতে বিদ্রোহী, আগমনী, ধূমকেতু প্রভৃতি কবিতা আছে। অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী বীরেশ্বর জৈন। 'দোলন চাঁপা (আশ্বিন ১৩৩০, ইং ১৯২৩) কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। 'ধূমকেতু' প্রকাশের দায়ে করাদণ্ডে দণ্ডিত কবি যখন জেলে, সেইসময় কবিতাগুলি লেখা। জেলের ওয়ার্ডারদের সাহায্যে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বাইরে এনে সেগুলি কাব্যাকারে প্রকাশ করেন। এ কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।' এ কাব্যের মুখ্য আবেগ প্রমীলা বা দোলন দেবীর সঙ্গে কবির সম্পর্ক। 'বিষের বাঁশী' (আগস্ট, ১৯২৪) বইটির সূচনায় জানিয়েছেন 'অগ্নিবীণা'র দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে যেটি প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল সেটি 'বিষের বাঁশী' নামে প্রকাশিত হল। এই

সব স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও নজরুল 'ছায়ানট' (১৯২৫), দেশবন্ধুর মৃত্যুশোকে উদ্বেল কবির চিত্তরঞ্জনের জীবনকাহিনী বর্ণনা করে 'চিত্তনামা' (আগস্ট, ১৯২৫) রচনা ও প্রকাশের পর কবির উল্লেখযোগ্য কাব্য 'সর্বহারা' (১৯২৬), যার অন্যতম কবিতা নারী এবং 'ফণিমনসা' (১৯২৭) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। সঞ্চিতা (১৯২৮) রবীন্দ্রনাথের চয়নিকার আদর্শে সে সময়ে প্রকাশিত সকল কাব্যগ্রন্থের নির্বাচিত কবিতার সংকলন—রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়েছে। কবি নজরুলের কিছু গল্পগ্রন্থ—ব্যাথার দান (১৯২২), শিউলিমালা (১৯২৮), এবং উপন্যাস 'বাঁধনহারা' (১৯২০), কুহেলিকা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০) প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গীত সংকলন 'চোখের চাতক' (১৯২৯) প্রতিভা সোম (বসু)-কে উৎসর্গীকৃত, চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১), গুলবাগিচা (১৯৩৩), গানের মালা (১৯৩৪), গীতিশতদল (১৯৩৪) প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। কবির কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থ, ছোটদের উপযোগী নাটক যেমন রচনা করেছেন তেমনই ওমর খৈয়াম ও হাফিজের কবিতা অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। এসমস্ত গ্রন্থের অনেকগুলি রচনা যেমন প্রাণের টানে লেখা, আবার সভা-সমিতিতে বক্তৃতা কর্ম বা অর্থে প্রয়োজনে কলম ধরা রচনাও আছে।

## ৫০.৪ মূলপাঠ—১ ঃ নারী (সর্বহারা)

### নারী

সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির-কল্যাণ-কর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা, করে নারী হেয়-জ্ঞান ?
তারে বল, আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর শয়তান।
অথবা পাপ যে—শয়তান যে—নর নহে নারী নহে,
ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে !
এ-বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ ?
অন্তরে তার মোম্‌তাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান !
জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,
সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।
পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ,
কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ।
দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ,

পুরুষ এসেছে মরুতৃষ্ণা ল'য়ে—নারী যোগায়েছে মধু।
শস্যক্ষেত্র উর্বর হ'ল পুরুষ চালাল হল ;
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।
নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শীষে।

স্বর্ণ-রৌপ্যভার
নারীর অঙ্গ-পরশ লভিয়া হ'য়েছে অলঙ্কার।
নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।
নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা, সুধায় ক্ষুধায় মিলে
জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে।
জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধুদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান্।
কোন্ রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে !
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি', কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা ?
কোনো কালে একা হয় নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয় লক্ষ্মী নারী।
রাজা করিয়াছে রাজ্য-শাসন, রাজারে শাসিল রাণী,
রাণীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি।

পুরুষ হৃদয়-হীন,
মানুষ করিতে নারী দিল তারে আধেক হৃদয় ঋণ।
ধরায় যাঁদের যশ ধনে না ক' অমর মহামানব,
বরষে বরষে যাঁদের স্মরণে করি মোরা উৎসব,
খেয়ালের বশে তাঁদের জন্ম দিয়াছে বিলাসী পিতা।
লব কুশে বনে ত্যজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা।
নারী সে শিক্ষা'র শিশু-পুরুষের স্নেহ প্রেম দয়া মায়া,
দীপ্ত নয়নে পরা'ল কাজল বেদনার ঘন ছায়া।
অদ্ভুতরূপে পরুষ পুরুষ করিল সে ঋণ শোধ,
বুকে ক'রে তারে চুমিল যে, তারে কলি সে অবরোধ।

তিনি নর-অবতার—
পিতার আদেশে জননীরে যিনি কাটেন হানি' কুঠার !
পার্শ্ব ফিরিয়া শুয়েছেন আজ অর্ধনারীশ্বর,
নারী চাপা ছিল এতদিন, আজ চাপা পড়িয়াছে নর !
সে যুগ হ'য়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক' নারীরা আছিল দাসী !
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি,
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে !
যুগের ধর্ম এই—
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই
শোনো মর্ত্যের জীব !
অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব !
স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষপুরীতে নারী,
করিল তোমায় বন্দিনী, বলো কোন সে অত্যাচারী ?
আপনারে আজ প্রকাশের তব নাই সেই ব্যাকুলতা,
আজ তুমি ভীরু আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কও কথা !
চোখে চোখে আজি চাহিতে পার না ; হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথার ঘোম্‌টা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও শিকল !
যে ঘোম্‌টা তোমা' করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ !
দুর ক'রে দাও দাসীর চিহ্ন আছে যত আভরণ !
ধরার দুলালী মেয়ে !
ফিরনা ত আর গিরিদরীবনে শাখী-সনে গান গেয়ে !
কখন আসিল 'প্লুটো' যমরাজা নিশীথ পাখায় উ'ড়ে,
ধরিয়া তোমায় পূরিল তাহার আঁধার বিবর-পুরে।
সেই সে আদিম বন্ধন তব, সেই হ'তে আছ মরি।
মরণের পুরে ; নামিল ধরায় সেইদিন বিভাবরী।
ভেঙে যমপুরী নাগিনীর মত আয় মা পাতাল ফুড়ি' !
আঁধারে তোমায় পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি !
পুরুষ যমের ক্ষুধার কুকুর মুক্ত ও পদাঘাতে

লুটায়ে পড়িবে ও চরণ-তলে দলিত যমের সাথে !
এতদিন শুধু বিলালে অমৃত, আজ প্রয়োজন যবে
যে-হাতে পিয়ালে অমৃত, সে হাতে কূট বিষ দিতে হবে।
সে-দিন সুদূর নয়—
যে-দিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয় !

## ৫০.৫ সারাংশ—১

সাম্যের গান গাওয়া কবির কাছে নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। বিশ্বের সমস্ত কল্যাণ অকল্যাণ সবেতেই নারী পুরুষের ভূমিকা আছে। খ্রিস্টিয় আদি পাপের পিছনে যে শয়তানের (Satan) কথা ভাবা হয় সেই অমঙ্গালের শক্তি নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই থাকা সম্ভব। তাই নারীকে এজন্য হেয় করা ঠিক নয়। বরং পৃথিবীর যা কিছু ভালো সেই সব সৃষ্টি—যা মঙ্গালময়—সম্পদ, জ্ঞান, গুণ সৌন্দর্য সমস্তেই নারীর অবদান আছে। দিনের শেষে তপ্ত দেহ মন নিয়ে পুরুষ ঘরে ফিরে নারীর কল্যাণস্পর্শে স্বস্তি শান্তি পেয়েছে। নারী বাইরে কর্মৈষণা জোগায়, ঘরে সে-ই কল্যাণী। দুয়ের শক্তিতেই সৃষ্টি রয়েছে সচল।

অলঙ্কার সে তো নারীদেহ স্পর্শেই সুন্দর। নারীর মিলন-বিরহে কাব্যসৃষ্টি। ক্ষুধা-সুধার মধ্য দিয়ে নিত্য নতুন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর অনেক বিজয় অভিযান, মানুষের সমস্ত কীর্তির পিছনে নারীর অবদান সীমাহীন।

নারীর উৎসাহ ও প্রেরণাতেই পৃথিবীতে অমর মনীষীরা মহান সব প্রয়াস করেছেন। নারীর কোমল হৃদয়ের স্পর্শেই শিশু-পুরুষ নির্বিশেষে স্নেহ প্রেম-প্রীতি দয়ামায়ায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে।

নারীর প্রেরণায়, শক্তিতে এতদিন যাঁরা আশ্রয় পেয়েছে, তারাই আজ নারীর মর্যাদাকে স্বীকার করছে না, এ বড়ো বিস্ময়। আজ সাম্যবাদের যুগ—নারী পুরুষের সমানাধিকার। পুরুষ নারীর উপর আধিপত্য বিস্তার বা তাকে বন্দী করতে চাইলে, তাকেই এক সময়, তারই সৃষ্ট কারাগারে বন্দী হতে হবে। কেননা এটাই যুগধর্ম—পীড়ন করলে নিজেকেই পীড়িত হতে হবে। সেই সঙ্গে নারীকেও আর স্বর্ণ-রৌপ্যের অন্ধকারে বন্দিনী থাকা চলবে না ; হাতের রুবি, পায়ের মল-শিকল, মাথার ঘোমটা ফেলে বেরিয়ে আসতে হবে। যারা একসময় পদানত করে রেখেছিল, তাদের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে, প্রয়োজনে পরাভূত করে, নারীকে বিশ্বজয় করতে হবে। আর তা হলেই অনাগত ভবিষ্যতে পুরুষের সঙ্গে নারীর জয় ঘোষিত হবে।

## ৫০.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'নারী' কবিতাটি কবির 'সাম্যবাদী' কবিতা গুচ্ছের অন্যতম। সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয় 'লাঙল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৫)। পরে 'সর্বহারা' (১৯২৬) কাব্যগ্রন্থে 'সাম্যবাদী'র অন্যান্য কবিতার সঙ্গে 'নারী'-ও সংকলিত হয়। কবিতাটিকে প্রকাশকালের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব।

'নারী' কবিতাটি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনার শুরুতেই, ভারতীয় জনজীবনে সাধারণভাবে নারীর কি স্থান ছিল এবং শতাব্দীর সূচনাকালের পরিস্থিতিটিও জানা দরকার। তাহলেই ঐতিহাসিক পশ্চাদ্‌ভূমিতে সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের নারী কবিতার আপেক্ষিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝে নেওয়া সহজ হবে।

এমন একটি কথা প্রচলিত আছে যে প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকেই নারীর স্থান উঁচুতে ছিল। মধ্যযুগে মুসলিম অধিকারের পর নারীর মর্যাদার অবনমন ঘটে। ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[১] তিনি দেখিয়েছেন বৈদিক সমাজ যখন ক্রমশ গোষ্ঠীযুদ্ধ, যূথবদ্ধ সমাজ ভেঙে পরিবার আশ্রিত বা কুলবদ্ধ সমাজে পরিণত হচ্ছে, তখন থেকেই পুরুষ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রাধান্যের কারণেই পুরুষের একাধিক প-ী-উপপ-ী বা গণিকা সম্ভোগ ; প-ীর সামান্য ত্রুটিও কুলে বা সমাজে ক্ষমা পেত না। তখন লক্ষ্য এক পুত্র সন্তান বৃদ্ধির দ্বারা সম্পত্তি বৃদ্ধি। পুরাণের কালেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।[২] ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এসময় বিশেষ সুবিধাভোগী একটি শ্রেণি সৃষ্টি হয়। তাদের স্বার্থ সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জন্য পরিবারের বৈধ সন্তানের জন্য সঞ্চয় রেখে যাওয়া। এজন্য পুরুষ স্ত্রীকে অন্য সমস্ত পুরুষের সাহচর্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট হল। মহাভারতে এর চরম উদাহরণ দেখা যায়—যে নারী স্বামী ব্যতীত কোন পুংলিঙ্গ বিশিষ্ট (নামের বস্তু) চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ ও দর্শন করেনা সে-ই ধর্মচারিণী। (১২/১৪৬/৮৮)। এ থেকে বলা যায়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিকাশের অনুপাতের সঙ্গে নারী তার স্বাধীনতা হারায়। এজন্য মধ্যযুগ পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। মধ্যযুগে ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্নতর ঐতিহাসিক পটভূমিতে এরই কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে মাত্র।

বর্তমান আলোচনায় এ প্রসঙ্গ দীর্ঘায়িত না করে, তাঁর উপসংহারটি উদ্ধৃত করা যাক—"বৈদিক ভারতবর্ষে নারীর মর্যাদা ছিল না, মানুষ বলে তার কোনো স্বীকৃতিই ছিল না। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাতেও ছিল না, তবে তাঁদের উত্তর পুরুষেরা এখন স্বীকার করে সে কথা ; বলে, নারী এই শতাব্দীতেই প্রথম অধিকার সচেতন হয়েছে, আগে সে অত্যাচারিতা বন্দিনীই ছিল।" শুধু আমরাই বলবার চেষ্টা করি প্রাচীন ভারতবর্ষে নারী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল।" "এতে শুধু যে সত্যের অপলাপ হয় তা নয়, অতীতকে যথার্থভাবে না দেখতে পাওয়ার জন্য অতীতের যে বিষ সমাজদেহে সঞ্চারিত, তাকে চিনতে, তার প্রতিষেধ করতে এবং সুস্থ এক ভবিষ্যতের প্রস্তুতি বিধান করতে অনাবশ্যক দেরি হয়।"

১৯২০র জানুয়ারিতে নজরুল করাচির সেনানিবাস থেকে এসে কলকাতার বন্ধু শৈলজানন্দ ও মুজফ্‌ফর আহমেদের সঙ্গে দেখা করে ফিরে যান। ঐ বছরই মার্চে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হলে কর্মহীন কবি প্রথমে শৈলজানন্দ পরে মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদের আশ্রয়ে বাস শুরু করেন। ইতোমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালেই সোভিয়েত বিপ্লব ঘটেছে (১৯১৭), ১৯১৯-এ প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক হয়েছে। দেশে দেশে 'সাম্যবাদে' আস্থাবান যুবসমাজ একটি সংগঠনের মধ্যে নিজেদের সংগঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। 'নবযুগ' (জুলাই ১৯২০) পত্রিকা পর্বে নজরুলের বিদ্রোহী[৪] ভূমিকার পর, 'ধূমকেতু' (আগস্ট ১৯২২) পর্বে বিপ্লবী ভূমিকার পরিচয় দিয়েছে। এরপর 'লাঙল'-এ কবিকে সাম্যবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যা নিয়ে ভাবতে দেখা যাচ্ছে।

---

১ ও ২ বৈদিক সমাজে নারীর স্থান। নারীর স্থান—রামায়ণে ও মহাভারতে। দ্রষ্টব্য ঃ প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য

৩ ডিসেম্বর, ১৯২১ কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ-এর নেতৃত্বে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার উদ্যোগ হয়েছে।

৪ বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯২২।

নজরুলের কাছে সাম্যবাদ / সমাজতন্ত্রবাদ বস্তুত দেশের মুক্তি সংগ্রামের একটি পথ মাত্র। সাম্যবাদের আদর্শে তাঁর কোনো তাত্ত্বিক শিক্ষা ছিল না। মুজফ্ফরের সান্নিধ্য ও সাহচর্য তাঁর আবেগপ্রবণ মনোধর্মে মানবপ্রেমের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, নিজের জীবনের দুঃখযন্ত্রণার যে পীড়ন ছিল, তাই, তাঁকে এই মতবাদের মৌনতত্ত্ব নয়, বাহ্য উদ্দীপনা তাঁকে অনুপ্রেরিত করেছে। ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে বিশের দশক থেকে প্রাক্ স্বাধীনতাপর্ব পর্যন্ত এটি ছিল এক সংশায়াতীত সংগ্রামী চেতনা।

কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্ফরের সঙ্গে কিছু কাল সমবাসী হলেও উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও রোমান্টিক কবির মনে মানব হিতৈষণা যতটা জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, সাম্যবাদী তত্ত্বের দ্বারা ততটা নয়। তাই নবযুগ বা ধূমকেতুতে জাতীয়তাবাদ 'মোসলেম ভারতে' ধর্মভাব যতটা সক্রিয় ছিল, মার্ক্সীয় ত্ত্ব ততটা প্রবল ছিল না। 'লাঙলে'র প্রধান পরিচালক, নজরুলের সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ সেটি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হল।

একসময় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮শ শতকের ইংরেজ 'বার্নস'-এর প্রভাবে 'সাম্যসাম' কবিতায় রুশ বিপ্লবের প্রসঙ্গ এনেছিলেন, আর মুজফ্ফরের প্রভাবে এর প্রায় দু দশক পরে নজরুল সর্বহারার মুক্তির জন্য সাম্যবাদী চেতনামূলক একগুচ্ছ কবিতা রচনা করেন। এতে রুশ বিপ্লবের প্রভাব কিছুটা থাকলেও, কমিউনিস্ট মতবাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। এই গুচ্ছের 'সাম্যবাদী' কবিতা—অর্থনৈতিক বা শ্রেণিচেতনার কবিতা নয়—মরমি সাধনার কবিতা, 'মানুষ', মানুষের চেয়ে বড়ো বা মহীয়ান কিছু নেই। কিন্তু এখানে স্রষ্টাকে অস্বীকার কার হয়নি। পুরোহিত তন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাত ঘোষণা করা হয়েছে। 'চোর-ডাকাত' কবিতায় ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শোষণের এবং মানবসব্যতার এক দেউলিয়া রূপ তুলে ধরা হয়েছে—দেখান হয়েছে ছোটোদের সব চুরি করেই বড়োরা বড়ো হয়েছে ; 'নারী' কবিতায় নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। এ কবিতায় কবির নারী জাতিকে পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদার আসন দেবার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে—এজন্য তিনি অনেক যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে স্বমত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হয়েছেন। এদিক থেকে কবিতাটিকে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ-বিরোধী কবিতা বলা যায় বটে, সেই সঙ্গে সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরও কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এখানে কবির দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—কারণ সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সমান। আবার নরী পুরুষের জীবনে উভয়ের স্নেহ ও প্রেম এক পরম সম্পদ—সঞ্জীবনী সুধা। উভয়ের ত্যাগ ও সহিষ্ণুতায় গড়ে ওঠে মানব সভ্যতার ইতিহাস। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, হৃদয়হীন পুরুষের কাছে নারী পায় অমর্যাদা ও আঘাত। পুরুষের এঅই অনুদার মনোভাবের কঠোর সমালোচনা আছে এ কবিতায়। নারী কবিতায় কবি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। নজরুলের নারী-সম্পর্কিত সাম্যচেতনার প্রকাশ ঘটেছে—

'বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি
কেহ রহিবেনা বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।
যুগের ধর্ম এই
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।

'সাম্যের যুগ আজি' এই বোধ থেকে এ কবিতা রচনার প্রেরণা বলেই নারী-পুরুষে কোন ভেদ নেই। বিশ্বের নিন্তর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের সমান ভূমিকা। কিন্তু নারীই প্রধানত তার ভার বহন করে। পুরুষের দ্বারা সংসার চলে না, নারীর জন্যই সংস্কার স্বর্গলোকে পরিণত হয়—

"এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে, যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ রস মধু-গন্ধ-সুনির্মল।"

পুরুষের জীবনের যত দাবদাহ নারীর স্নেহ-প্রেমে তা স্নিগ্ধ হয়। এই নারী-ই যুগ যুগ ধরে কবির সৃষ্টিশীল রচনার প্রেরণা জুগিয়ে আসছে—

নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।

নজরুল এই কবিতাটিতে বক্তব্যবিষয়কে তার কবিস্বভাবের উচ্ছ্বাসময়তার কারণে আকারে অনেকটা বড়ো করেছেন। বক্তব্যকে দীর্ঘায়ত করায় কাব্য সৌন্দর্য বিচারে কবিতাটির রসাবেদন ক্ষুণ্ণ হয়ে তা বাক্ সর্বস্ব ও বক্তৃতাধর্মী হয়েছে। তিনি এখানে নরনারীর পাপ-পুণ্যের কথা, কল্যাণ-অকল্যাণ, পুরুষ-নারীর পারস্পরিক ভূমিকার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতার অভাব নেই যেমন কৃষি নির্ভর বাংলার গ্রাম সমাজে নরনারীর যৌথ পারিবারিক জীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে একটি বাস্তবসম্মত চিত্রকল্প—

নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শীষে।

আবার, পুরুষ শাসিত সমাজে নারী যুগ যুগ ধরে উপেক্ষিত, নারী জাতির বেদনা ও ট্র্যাজেডি এ কবিতায় অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন—

কোন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে।

সামন্ত সমাজে নারী নানা আবরণে, আভরণে বাঁধা পড়ে থাকে, তাকেই সাম্যবাদের টানে কবি নজরুলের নারীমুক্তির কথা অত্যন্ত জোরালোভাবে আহ্বান হিসেবে ফুটে উঠেছে—

হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথার ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও শিকল।
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ!
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন আছে যত আভরণ!

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ "সে যুগ হয়েছে বাসি, যে যুগে...নারীরার আছিল দাসী।" সেই বেদনার যুগ পার হয়ে আজ "মানুষের যুগ সাম্যের যুগ আজি", তাই "অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব।" আধুনিক সমাজব্যবস্থায় নারী সঙ্গী, সাথী বন্ধু। নজরুলের 'নারী' কবিতায় নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়।

নারী কবিতাটি ছয়মাত্রার সরল কলাবৃত্ত ছন্দে রচিত। ছত্রে তিনটি ষন্মাত্রিক পর্ব, একটি দু-মাত্রায় অপূর্ণ পর্ব।

বিশ্বে যা কিছু । মহান সৃষ্টি । চির কল্যান। কর

অর্ধেক তার । রচিয়াছে নারী । অর্ধেক তার । নর।

পূর্বাপর দ্বিপদী অন্তমিল যুক্ত পদবন্ধে রচিত। কয়েকটি ছত্রে একই যুক্তাক্ষরের পুনরাবৃত্তিতে সার্থক শব্দালঙ্কারের ও ধ্বনি ঝঙ্কারের মাধ্যমে সার্থক চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছে—

'জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,

সুষমা লক্ষ্মী, নারী-ই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।'

**প্রসঙ্গ কথা ঃ**

*নরককুন্ড বলিয়া কে তোমা*—বৈদিক ভারতে নারীকে অশুচি, স্বাভাবত পাপিষ্ঠা ও অমঙ্গালের হেতু গণ্য করা হয়েছে। মৈত্রায়নী সংহিতা বলেছে 'নারী অশুভ।' শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—যজ্ঞ কালে, শূদ্র ও নারীর দিকে তাকাবে না। তাঁদের সংজ্ঞায় নারী পুত্রের জননী এবং সে ভোগ্যবস্তু। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীতেও যজ্ঞের দক্ষিণা হিসাবে গাভী-স্বর্ণ-শস্যের সঙ্গে অগণ্য নারী দান করা হচ্ছে। খ্রিস্টীয়শাস্ত্র বাইবেলেও নারীকে 'নরকের দ্বার' বলা হয়েছে। নারীর এই অবমাননার অবসান আধুনিক কালের ঘটনা। সাম্যবাদী কবিতার 'নারী'তে নজরুলের তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ এই ব্যভিচারের বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য নারী যদি অশুচি-অপবিত্র সে তো পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষেরই দান। সুতরাং এর জন্য তো মূল অপরাধী পুরুষ। নারীকে নরককুন্ড বলে ঘৃণা করা কেন ? কামনার অগ্নিদহনের জন্য দায়ী পুরুষ তাই ঘৃন্য সে তো পুরুষ। সুতরাং নারীকে কোনক্রমেই হেয় জ্ঞান করা যায় না।

*এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল*—নারীর স্নেহপ্রেম প্রীতি রসে আর্দ্র ও তার সয- লালনে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি আজও সচল ও সক্রিয়। বিশ্বসৃষ্টির যে নেপথ্যবিধানে প্রাণের প্রকাশ সে ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারী যেমন ধারণ ও লালন করে, তেমনি সমস্ত সৃষ্টির প্রেরণাও নারী—এই সত্যটিকে নজরুল পংক্তিগুলিতে তুলে ধরেছেন।

*পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই*—সম্পত্তির ধারণা গড়ে ওঠার সময় থেকে পুরুষের যে শক্তি, প্রাধান্য ও অধিকারদম্ভ ক্রমশ নানারূপে ও বাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তা বৈদিক কাল থেকে পৌরাণিক যুগ বাহিত হয়ে সামন্ত শাসন পর্যন্ত ব্যপ্ত হয়েছে। আধুনিক মননে ও সমাজ-রাষ্ট্র ধারণায় এর অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে নিপীড়িত মানুষের যে জাগরণ বাস্তবায়িত হল, তা নারীকেও তাঁর আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই যে কোনো ধরনের পীড়নের সঙ্গে প্রতিরোধ-শক্তিও বৈজ্ঞানিক নিয়মেই গড়ে ওঠে—এই সত্যটি কবি এখান উচ্চারণ করেছেন।

*এতদিন শুধু বিলালে অমৃত*—একদিন যে নারী অন্দরের অন্ধকারে কারারুদ্ধ ছিল, তাকে সেই আদিম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে আসতে হবে। এজন্য প্রয়োজন হল প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম হবে। কারণ বন্ধন থেকে মুক্তি কেউ দেয় না, নিজ অধিকারে অর্জন করতে হয়। ভারতবর্ষের মতো ইউরোপের পুরুষকেন্দ্রিক সমাজেও ব্যতিক্রম ছিল না। বিশ্বের যা কিছু মহান, 'অর্ধেক তার করিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী। নারীকে সেই

সমানাধিকার থেকে সামাজিক ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে বঞ্চিত করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে নারীমুক্তি আন্দোলন তার শোধনের কাজ করেছে। সাম্যবাদী চিন্তাধারা নারী পুরুষের সমান অধিকারকে মানে। তাই প্রয়োজনে নারীকে প্রতিবাদী ও সংগ্রামী প্রয়াস নিতে হবে। 'আজ প্রয়োজন যবে, যে হাতে পিয়ালে অমৃত, সে হাতে কূট বিষ দিতে হবে।' কবির আশা 'সে দিন সুদূর নয়।' বিশ্বব্যাপী এই আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 'ধরণী পুরুষের সাধে গাহিবে নারীরও জয়'।

## অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৭২ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন অথবা প্রয়োজনে ৫০.৬ অংশের প্রাসঙ্গিক আলোচনা কয়েকবার পড়ুন। উত্তর করতে পারবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) রাজা করিয়াছে _____, রাজার _____।

রাণীর দরদে _____ গিয়াছে _____ যত _____।

খ) মাথার _____, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও _____।

যে _____ তোমা করিয়াছে _____ _____ সে।

দূর করে দাও _____ চিহ্ন আছে যত _____।

২) কোন্ রচনা প্রকাশের জন্য কাজী নজরুলের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়?

৩) "১৯১৭-র সোভিয়েত বিপ্লব নতুন সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে।" নতুন সম্ভাবনার কথাগুলি কী, সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪) "তাঁর (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত) মরুকাব্যত্রয়ী বাংলার শ্যামল আবহাওয়ায় উষর, রুক্ষ, নৈরাশ্যের ছবি নিয়ে এসেছে।"—কাব্যত্রয়ীর নাম ও প্রকাশকাল উল্লেখ করুন।

৫) সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) কবিতায় তীব্র যৌবন-কামনা প্রকাশ পেয়েছে—
- (১) রবীন্দ্রনাথ-এ।
- (২) সত্যেন্দ্রনাথ-এ।
- (৩) মোহিতলাল-এ।

খ) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্য—
- (১) হেমন্ত গোধূলি।
- (২) সায়ম্।
- (৩) ব্যথার দান

গ) কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করেন—
(১) চরকার গান।
(২) ভাঙার গান।
(৪) পালকির গান।

ঘ) 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা—
(১) নজরুল ইসলাম।
(২) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
(৩) মোহিতলাল মজুমদার।

ঙ) কাজী নজরুল ইসামের বিদ্রোহী কবিতার প্রথম প্রকাশ—
(১) ১৯২২-বিজলীতে
(২) ১৯২০-সওগাতে-এ
(২) ১৯২০ মোসলেম ভারত পত্রিকায়।

৬) নজরুল ইসলাম সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এরকম যে কোনো তিনটি পত্রিকার নাম করুন।

৭) ক) 'এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল'—ইত্যাদি অংশটির অর্থ ও তাৎপর্য আলোচনা করুন।

খ) "এতদিন শুধু বিলালে অমৃত"-এই উদ্ধৃতিটির মধ্য দিয়ে কবি কী বলতে চেয়েছেন বুঝিয়ে দিন।

## ৫০.৭ মূলপাঠ—২ — দারিদ্র্য

### দারিদ্র্য

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে ক'রেছ মহান !
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা ! দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হল তরবার !

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ !
শীর্ণ করপুট ভরি সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু তুমি
অগ্রে আসি কর পান ! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ !

বেদনাহলুদ-বৃন্দ কামনা আমার
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি উঠিতে চাহি, তুমি হে নির্মম
দলবৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া-সম !
আশ্বিনের প্রভাতের মত ছলছল
ক'রে ওঠে সারা হিয়া, শিশির-সজল !

টলটল ধরণীর মত করুণায় !
তুমি রবি তব তাপে শুকাইয়া যায়
করুণা নীহার বিন্দু ! ম্লান হ'য়ে উঠি
ধরণীর ছায়াঞ্চলে ! স্বপ্ন যায় টুটি
সুন্দরের, কল্যাণের ! তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি তুমি বল, 'অমৃতে কি ফল !

জ্বালা নাই নেশা নাই উন্মাদনা,—
রে দুর্বল, অমরার অমৃত-সাধনা

এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে !
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে।
কাঁটা-কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা,
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার 'টীকা' !....
গাহি গান, গাঁথি মালা, কণ্ঠ করে জ্বালা,
দংশিল সর্বাঙ্গে মোর নাগ নাগ-বালা।....

ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফের, দ্বারে দ্বারে ঋষি
ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা ! যাপিতেছে নিশি
সুখে বর-বধূ যথা—সেখানে কখন্
হে কঠোর-কণ্ঠ গিয়া ডাক, 'মূঢ়, শোন্,
ধরণী বিলাস কুঞ্জ নহে নহে কারো,
অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ আরো
আছে কাঁটা শয্যাতলে বাহুতে প্রিয়ার,
তাই এবে কর ভোগ !'—পড়ে হাহাকার
নিমেষে সে সুখ-স্বর্গে, নিবে যায় বাতি,
কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি !

চল পথে অনশন ক্লিষ্ট ক্ষীণ তুন,
কী দেখি বাঁকিয়া ওঠে সহসা ভ্রূ-ধনু,
দু'নয়ন ভরি রুদ্র হান অগ্নি বাণ,
আসে রাজ্যে মহামারী দুর্ভিক্ষ তুফান,
প্রমোদ-কানন পুড়ে, উড়ে অট্টালিকা,—
তোমার আইনে শুধু মৃত্যু-দণ্ড লিখা।

বিনয়ের ব্যাভিচার নাহি তব পাশ,
তুমি চাহ নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ।
সঙ্কোচ শরম বলি জান না কো কিছু,
উন্নত করিছ শির যার মাথা নীচু।
মৃত্যু-পথ-যাত্রীদল তোমার ইঙ্গিতে
গলায় পরিছে ফাঁসি হাসিতে হাসিতে !
নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুকে
সাধিতেছ মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে !

লক্ষ্মীর কিরীটী ধরি ফেলিতেছ টানি
ধুলিতলে ! বীণ-তারে করাঘাত হানি
সারদার, কী সুর বাজাতে চাহ গুণী ?
যত সুর আর্তনাদ হ'য়ে ওঠে শুনি !

প্রভাতে উঠিয়া কালি শুনিনু, সানাই
বাজিছে করুণ সুরে ! যেন আসে নাই
আজো কা'রা ঘরি ফিরে ! কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ডাকিছে তাদের যেন ঘরে 'সানাইয়া' !
বধূদের প্রাণ আজ সানা'য়ের সুরে
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে
আসি আসি করিতেছে ! সখী বলে, 'বল্
মুছিলি কেন লা আঁখি, মুছিলি কাজল ?'

শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছি তেমনি সানাই !
ম্লানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি
বিধবার হাসি সম—স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি !
নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়
দুরন্ত নেশায় আজি, পুষ্প-প্রগল্‌ভায়
'চুম্বনে বিবশ করি' ! ভোমোরোর পাখা
পরাগে হলুদ আজি, অঙ্গে মধু মাখা।

উছলি' উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ !
আপনার অগোচরে গেয়ে উঠি গান
আগমনী আনন্দের ! অকারণে আঁখি
পু'রে আসে অশ্রু-জলে ! মিলনের রাখী
কে যেন বাঁধিয়া দেয় ধরণীর সাথে !
পুষ্পাঞ্জলি ভরি দুটি মাটি মাখা হাতে
ধরণী এগিয়ে আসে, দেয় উপহার।
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার !
সহসা চমকি উঠি ! হয়ে মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে, খাও নি ক' কিছু
কালি হ'তে সারাদিন তাপস নিষ্ঠুর,
কাঁদ মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর !

পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে !—মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি ! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি ! কে বাজাবে বাঁশী ?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি ?
কোথা পাব পুষ্পাসব ?—ধুতুরা গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্যাস।...

আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাই, কিছু নাই।
[সিন্ধু-হিন্দোল]

২৪ আশ্বিন, ১৩৩৩।

## ৫০.৮ সারাংশ—২

দারিদ্র্য মানুষকে তার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করে। মানুষের প্রকৃত সত্তা, তাঁর মনুষ্যত্বের প্রকৃত চেহারা এ সময়েই ফুটে ওঠে। ভারতীয় জীবনবোধের মধ্যে যে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় আছে, তা কখনই ঐশ্বর্য বিকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে না। তাই দারিদ্র্যই মানুষকে মহতের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই যথার্থ শক্তির তীব্রতা প্রকাশ পায়।

দুঃখের দহন তাপে জীবনের সমস্ত রস যখন শুকিয়ে যায় তখন দু চোখে শুধু আগুন জ্বলে। ফুলের সৌরভ আর তেমন ছড়ায় না। পৃথিবীর সমস্ত করুণা ধারা যখন সূর্যের খরতাপে শুষ্ক হয় তখন আর জীবনের স্বপ্ন, তার সুন্দর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা বেদনার ভার নিয়ে যে গান রচনা হয় তা তো বেদনারই গান। তখন মনে হয় দারিদ্র্য ছাড়া জীবনের কোনো কিছুই আর সত্য নয়। মহা দারিদ্র্যের প্রলয়ঙ্কর শক্তি সর্বস্ব গ্রাস করতে উদ্যত।

এরই মধ্যে পৃথিবী যখন অপরূপ সৌন্দর্যে পূর্ণ হয়, আগমনীর আনন্দের সুর ধ্বনিত হয়, তখন আশা জাগে, ম্লানমুখী শেফালিকাও ঝরে পড়বার আগে গন্ধ বিলিয়ে যায়। প্রজাপতি নেচে বেড়ায় পুষ্প থেকে পুষ্পে চঞ্চল পাখায়। এর মধ্যে কবি-প্রাণে বেদনার করুণ সুর বেজে ওঠে। আগমনী গানের মধ্যে যেন শুনতে পাওয়া যায়, নাই, কিছু নাই।

## ৫০.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'দারিদ্র্য' কবিতাটির রচনাকাল ২৪শে আইশ্বন ১৩৩৩ (ইং অক্টোবর ১৯২৬)। এসময় কবি বন্ধু হেমন্ত কুমার সরকারের ব্যবস্থাপনায় কৃষ্ণনগর বাস করছিলেন। সেকানে নজরুল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন ও ছাত্র-যুবা

সম্মেলনে শ্রমিকের গান ও ছাত্রদলের গান রচনা করে গেয়েছেন। সেপ্টেম্বর মাসে কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল-এর জন্ম। এসময় কবি সংসার পরিচালনা করতে গিয়ে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে নিত্য লড়াই করেছেন। 'দারিদ্র্য' কবিতা প্রত্যক্ষত এই নিষ্করুণ দুর্দিনের প্রেক্ষাপটে রচিত। কবিতাটি প্রথম 'কল্লোল' পত্রিকায়, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ এ, পরে 'সওগাত'-এ মাঘ ১৩৩৩-এ পুনর্মুদ্রিত হয়। পরে কবির সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী কবিতার সংগ্রহ গ্রন্থ 'সিন্ধু হিল্লোল' (১৩৩৪)-এ সংকলিত হয়। 'সিন্দু-হিল্লোল' প্রেমের কবিতা সংগ্রহ।

'দারিদ্র্য' কবিতা রচনার ও প্রকাশের প্রেক্ষাপট কবির অপর সহযোগী বন্ধু মুজফ্‌ফর আহমদ-এর বর্ণনায়—"নজরুল ইসলাম তখন কৃষ্ণনগরে থাকত, আমি আরও কজনের সঙ্গে থাকতাম ওয়ার্কাস এণ্ড পেজান্টস পার্টির অফিসে...। আমাদের অফিস হতে পটুয়াটোলা লেনে 'কল্লোলে'র অফিস নিকটে ছিল। একদিন কি কারণে নজরুল কলকাতায় এসে ফিরে যাচ্ছিল। ....যাওয়ার আগে আমার হাতে সে 'দারিদ্র্যে'র পাণ্ডুলিপিখানা দিয়ে বলল, 'এটা ভাই তুমি কল্লোল অফিসে পৌঁছে দিও। .....দিনেশ রঞ্জন দাশ মনিঅর্ডার যোগে দশটি টাকা পাঠিয়েছিলেন। একটি কবিতাও চেয়েছিলেন সেই সঙ্গে। এই কবিতাটি লিখেছি বড় দুঃখে।"

নজরুল গবেষক ড. মিলন দত্ত এ সময়ের কিছু তথ্য প্রমাণ হাজির করেছেন। ড. দত্ত লিখেছেন—"ঘরে দারিদ্র্যে শতমুখী আক্রমণ। যে আক্রমণে প্রমীলা ও গিরিবালা জর্জরিত। .....অক্টোবর মাসে ৯ তারিখে প্রমীলা একটি পুত্র সন্তান (বুলবুল) প্রসব করলেন। ...ঘরে টাকা নেই। টাকার প্রচন্ড দরকার। চিঠি লিখলেন প্রকাশক ব্রজবিহারী বর্মনকে—'টাকার বড্ড দরকার। যেমন করে পার পঁচিশটি টাকা আজই টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার করে পাঠাও।' ব্রজবিহারী পনেরো টাকা পাঠিয়েছিলেন। টাকা পেয়ে তাকে জানালেন—'চিন্তার মধ্যে অর্থ চিন্তাটাই সবচেয়ে বড়।' অপর এক চিঠিতে বন্ধু মুরলীধর বসুকে লিখেছেন—"নিত্য অভাবের চিত্ত ক্ষোভ আমায়... দুর্বল করে তুলছে।..." মুরলীধরকে কয়েকটি কবিতা পাঠিয়ে 'বঙ্গাবানী' থেকে টাকা সংগ্রহ করে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। আক্ষেপ করেছেন, "আর মান ইজ্জত রইল না,... অর্থাভাব বুঝি মনুষ্যত্বটাকে কেড়ে নেয় শেষে।"—এরই মধ্যে কবির দ্রারিদ্র্য কবিতা—

হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান ...।

জনৈক সমালোচক কবিতায় মর্মসত্যটি তুলে ধরেছেন—১৩৩৩ সালের শরৎকালে কৃষ্ণনগরে আগমনীর করুণ সানাইয়ে যেন কবির জীবনের ব্যথা-বেদনার কান্না ঝরে পড়ছিল, সেই মুহূর্তের অমর সৃষ্টি 'দারিদ্র্য'[১]।

এ কবিতায় কবি জীবনের প্রতি গভীর অনুরাগ বশত যে চিত্তক্ষোভ, বেদনাভার মনকে বিচলিত করেছে সে তো জীবনকে একান্ত করে ভালবাসার কারণেই। এদিক থেকে সিন্ধু হিল্লোলের গভীর জীবনরসরসিকতা বা প্রেমভাবনার কোনো বিরোধ নেই।

এ কবিতায় 'দারিদ্র্য' দুঃসহ দহনে প্রাণের রূপরসসৌগন্ধ্য শুষে নিয়ে জীবনকে বিবর্ণ করলেও, কবির জীবনানুরাগ বেদনায় ম্রিয়মাণ হলেও তা শেফালির শুভ্র সুরভি ছড়াতে পরাঙ্মুখ হয়নি। আশাহীন ভরসাহীন বিশুষ্ক দিনগুলিতেও কবি দেখেন, 'নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়, দুরন্ত নেশায়, পুষ্প প্রগ্‌লভায় চুম্বনে বিবশ করি।" শত হতাশার মধ্যেও এই আশার কথা, ভরসার কথা কবি নজরুলের পক্ষেই বলা সম্ভব।

---

১ রফিকুল ইসলাম—কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও কবিতা। পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৭

এ কবিতায় কবি আবেগের তীব্রতা নিয়ে বক্তব্যকে অত্যন্ত দৃঢ় সংবদ্ধভাবে প্রকাশ করেছেন। কবিতার প্রথম স্তবকটিতে যে কথা বলেছেন, তা কোন মহৎ শিল্পীর পক্ষেই বলা সম্ভব। দারিদ্র্য কবিকে মহান করেছে, খ্রিস্টের সম্মান দান করেছে—এ কথার মধ্য দিয়ে দীনহীন আস্তাবলে মাতা মেরির সন্তানের জন্মের বার্তা যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে, তা স্মরণাতীত কালের জ্যোতিমণ্ডিত এক অম্লান ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কবিও যেন দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে এক মহত্তর জীবনের সন্ধান পেয়েছেন। পার্থিব সম্পদ রিক্ততার মধ্যে জীবনের পরীজ্ঞা দিয়ে, মহত্তর জীবনের বাণীকে লাভ করেছেন, আর সেই প্রাণ-শক্তিতেই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবনের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে জীবনকে ভালোবেসে তার প্রেমসৌন্দর্যকে কাব্যে সংগীতে তুলে ধরেছেন। সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়েই কবি সৌন্দর্যকে যেমন দেখেছেন, তেমনই দেখেছেন রিক্ত জীবন ব্যথিতের অশ্রু। দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েই কবি অর্জন করেছেন সেই শক্তি যা মোহমুক্ত দৃষ্টিতে 'সত্যকে' দুরন্ত সাহস ভরে অসংকোচে, স্পষ্ট ও ক্ষুরধার ভাষায় প্রকাশ করেছে। কবির শিল্পী সত্তা, তাঁর সৌন্দর্য চেতনা, সৃষ্টিশীল আবেগ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়েছে দারিদ্র্যরূপী নিয়তির সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে। তার পরিচয় পাওয়া যায়—

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস—পংক্তিদ্বয়ে।

সুন্দরের দান গ্রহণ করবার জন্য কবির মন যখনই উন্মুখ হয়েছে, তখনই দারিদ্র্য, ভয়ংকর ক্ষুধারূপে জীবনের সমস্ত সৌন্দর্যসাধনাকে ব্যর্থ করেছে। কল্পনার জগৎ হয়েছে যেন শূন্য মরুভূমি, এ যেন নিয়তির সঙ্গে কবির সৌন্দর্য কল্পনার সংঘাত।

কবিতাটির রচনাকাল আশ্বিন, শরৎকাল,—শারদীয়া উৎসবের কাল, আগমনীর সানাই, শেফালির শুভ্রতা ও তার প্রাণমাতানো সুবাস বাঙালির গৃহ জীবনকে বর্ণগন্ধময় করে তোলে। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে কবির সৌন্দর্যচেতনায় করুণ পরিণতি ফুটে উঠেছে—

বেদনা-হলুদ-বৃন্ত কামনা আমার
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম
দলবৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া-সম।"

এই ছত্রগুলিতে এক মর্মান্তিক বেদনাবিধুর অভিজ্ঞতার চিত্ররূপ আঁকা হয়েছে। তবুও কবি হতোদ্যম হননি। তিনি কণ্ঠে জ্বালা নিয়েও গান গেয়ে মালা গেঁথে চলেছেন। 'ক্ষমাহীন দুর্বাসা'র মতো ক্ষুধার্ত সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরছে। সে যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—দুর্বাসার অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতেই পৃথিবীতে মহামারি দুর্ভিক্ষ, তুফান দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসে—

ধরনী বিলাস-কুঞ্জ নহে নহে কারো
অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ আরো,
আছে কাঁটা শয্যাতলে, বাহুতে প্রিয়ার
তাই এবে কর্ ভোগ।

এসব সত্য বটে, কিন্তু আরও সত্য এরই মধ্যে আছে শরতের আনন্দময়ীর আগমনে সানাই-এর সুরে আগমনী গান—এ যেন প্রবাসী প্রিয়তমের প্রতীক্ষার কাল শেষের গান—

বধূদের প্রাণ আজ সানায়ের সুরে
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে
আসি আসি করিতেছে।

আর প্রিয় সখী বলে, "বল্ মুছিলি কেন না আঁখি, মুছিলি কাজল।"—এখানেই ফুটে উঠেছে শত বেদনায়, শত হতাশায়—আশার প্রদীপ জ্বালবার সংবাদ।

জীবনের এই বিচিত্র রূপৈশ্বর্যে কবিপ্রাণ যখন সুরে তালে লয়ে উদ্‌বেলে হয়ে ওঠে তখনই 'ধরিত্রী এগিয়ে আসে, দেয় উপহার। ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।' —এই অনুভব যখন জাগে, তখনই 'সহসা চমকি' উঠে মনে পড়ে যায় দারিদ্র্যের নির্মম যন্ত্রণার কথা। তাঁর ক্ষুধাতুর শিশু দুদিন না খেয়ে জেগে উঠে কাঁদছে। দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে না পারায় বেদনাহত কবিপ্রাণ আত্মগ্লানিতে বলেন আগমনীর আগমনে তাঁর আনন্দের নেই অধিকার।

'দারিদ্র্য' নজরুলের একটি অনবদ্য কবিতা। দারিদ্র্যের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মানবজীবনের রস ও সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে। তবি জীবনে দারিদ্র্যের সুতীব্র জ্বালা কবিতাটিকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী কবিসত্তা অবনমিত হয় নি। পবির্তে উপহার দিয়েছে এক সংগ্রামী চেতনা।

কবিতাটি সমিল প্রবহমান মিশ্রকলা বৃত্ত ছন্দে রচিত।

শীর্ণ করপুট ভরি / সুন্দরের দান।।
যতবার নিতে যাই/—হে বুভুক্ষু তুমি।।
অগ্রে আসি কর পান।**/শূন্য মরুভূমি।।
হেরি মম কল্পলোক।**/আমার নয়ন।।
আমারি সুন্দরে করে/অগ্নি বরিষণ।**।।

শ্বাসযতি ও অর্থযতির বিযুক্তি ও পরস্পর দুটি ছত্রে অন্ত্যমিল বা মিত্রাক্ষর। ছত্রের দ্বিপর্বিক মাত্রাবিন্যাস যথাক্রমে ৮ + ৬ মাত্রার।

শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস যথা ঃ উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, তরল গরল, অমরার অমৃত-সাধনা। অর্থালঙ্কার—যথা উৎপেক্ষা—"উছলি উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ," "ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার/ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।"

**উপমা ঃ** শেফালির মতো শুভ্র সুরভি বিথার,

**সমসোক্তি ঃ** শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।

উদ্ধৃত অলংকারগুলি কবতিার বিশেষ তাৎপর্য বাড়িয়েছে শুধু নয় কাব্যকেও ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করেছে।

**শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা—**

*দানিয়াছে খ্রিষ্টের সম্মান*—যীশু জাতিতে ছিলেন ইহুদি। তিনি পরমেশ্বরের দ্বারা নির্বাচিত দূত। খ্রিস্ট একজন মুক্তিদাতারূপে গণ্য হল। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমত খ্রিস্ট ধর্ম নামে পরিচিত। যীশুর প্রথম শিষ্যরাও ইহুদি ছিলেন।

তিনি তাঁর বাণী প্রচার এবং নানা অলৌকিক মহিমা প্রকাশ করলে ইহুদিরা তাঁকে খ্রিস্ট বলে মেনে নেন। যীশুর এই কার্যাবলি ইহুদি ব্যতিরিক্ত অন্যদের মধ্যে প্রচার করলে, নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যীশুর বিশ্বজনীন ও আধ্যাত্মিক বাণী অনেক ইহুদি নেতা ও যাজকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। তারা মিথ্যা রাজদ্রোহের অভিযোগে যীশুকে বিদেশি শাসনকর্তার হাতে সমর্পণ করে এবং শেষে কাঁটার মুকুট পরিয়ে বহু অপমান ও যন্ত্রণার মধ্যে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। যীশু বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুবরণ করেন এবং মানুষের পাপ ও অপরাধের জন্য স্বয়ং প্রায়শ্চিত্তের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন।

যীশু যেমন বিনা অপরাধে মৃত্যুবরণ ও মানুষের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করেছেন, তেমনি কবিও যেন বিনা দোষে সীমাহীন দারিদ্র্যের দ্বারা পীড়িত ও যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে কাল যাপন করেছেন। এই জীবন-যন্ত্রণা কবির মনে যে ভাবানুভূতি সৃষ্টি করেছে, তা-ই 'দারিদ্র্য কবিতার উৎস' যীশু যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহত্তর জীবনের সত্যকে তুলে ধরেছেন, কবিও এই জীবন-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জীবনের মহত্তর সত্যকে আবিষ্কার করেছেন।

*ঋষি ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা*—কোপন স্বভাবের জন্য খ্যাত পৌরাণিক ঋষি। এ থেকে প্রচলিত কথায় ক্রোধী ব্যক্তিকে 'দুর্বাসা' বলা যায়। তাঁর উগ্র স্বভাবের পরিচয় নানা কাহিনির মধ্যে পাওয়া যায়। কালিদাস 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে পতিচিন্তায় নিমগ্না অনন্যমনা শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার কঠোর অভিশাপের বিবরণ দিয়েছেন। এই অভিশাপের ফলে পতি দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হন এবং তাঁকে দীর্ঘকাল পতিবিরহ বেদনা সহ্য করতে হয়।

(সূত্র ঃ ভারতকোষ, খণ্ড—৪)

কবি নজরুল ইসলামের 'দারিদ্র্য' কবিতায় দারিদ্র্যের সীমাহীন নিপীড়ন কবি চিত্তকে বিহ্বল করেছে। তিনি এর কোনা কারণই খুঁজে পান নি। যখনই তিনি কাব্যলক্ষ্মীর প্রেরণায় সত্য সুন্দরের সাধনায় নিরত হয়েছেন তখনই কোনো অজ্ঞাত পথে ক্ষুধা, দুঃখ দারিদ্র্যের যন্ত্রণা তাঁর স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়েছে। আর ক্ষুধার তাড়নায় অর্থের প্রয়োজনে দ্বারে দ্বারে আবেদন জানাচ্ছেন—"টাকার বড্ড দরকার....অন্তত পঁচিশটি টাকা পাঠাও" বা দুটি গান পাঠিয়ে প্রত্যাশা করেছেন যদি ওঁরা টাকাটা দেয় তা হলে খুব উপকার হয় অথবা ভাবছেন, "অর্থাভাব বুঝি মনুষ্যত্ব কেড়ে নেয় শেষে।"—এই অর্থচিন্তার প্রেক্ষাপটে এই 'দারিদ্র্য' কবিতা, তাই 'দুর্বাসার' শাপের মত 'ক্ষুধা, দারিদ্র্য' কবিকে যন্ত্রণা বিদ্ধ করেছে একথা বলেছেন।

*লক্ষ্মীর কিরীটী*—ইত্যাদি—লক্ষ্মীর স্বর্ণমুকুট, সরস্বতীর বীণা ঐশ্বর্য ও সৃষ্টিশীল সৌন্দর্য কল্পনার প্রতিভূ—এ তো ধরণীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিশ্বসম্পদের বিচিত্র বৈভব যে গুণীজন সৃষ্টি করেন, তাঁদের উপর দারিদ্র্যের অমোঘ আক্রমণ সে সৃষ্টিকে অকালে বিনষ্ট করে, বিরূপ প্রতিকূলতায় সমস্ত 'সুর' যেন আর্তনাদ হয়ে ওঠে।

## অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৭২ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। অন্যথায় ৫০.৮ এর মূলপাঠ এবং ৫০.১০ এর প্রাসঙ্গিক আলোচনা ভালো করে পড়ুন। তাহলেই, যথাযথ উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হবে।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) _____ দৃষ্টি, বাণী _____

বীণা মোর _____ তব হল _____।

খ) তুই নাগ, _____ তোর _____ দহে।

_____ বসি তুই গাঁথিবি _____,

গ) বীণা-তারে _____ হানি

_____, কী সুর বাজাতে চাহ _____ ?

যত সুর _____ হয়ে ওঠে শুনি।

২) 'দারিদ্র্য' কবিতার মূল বক্তব্য সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিন।

৩) 'দারিদ্র্য' কবিতার ছন্দ-রীতি সম্পর্কে আপনার অভিমত চারটি ছত্র উদ্ধৃত করে আলোচনা করুন।

৪) 'দারিদ্র্য' কবিতা থেকে একটি করে অনুপ্রাস, উপমা, ও উৎপ্রেক্ষা অলংকারের উদাহরণ দিন।

৫) ক) 'দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান কন্টক মুকুট শোভা'—উদ্ধৃতির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

খ) 'দুর্বাসা' কে ? তাকে ক্ষমাহীন বলবার কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

## ৫০.১০ মূলপাঠ—৩ ঃ গানের আড়াল

### গানের আড়াল

তোমার কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি মোর কণ্ঠের গান—
এইটুকু শুধু র'বে পরিচয় ? আর সব অবসান ?
অন্তর-তলে অন্তর-তর যে ব্যথা লুকায়ে রয়,
গানের আড়ালে পাও নাই তার কোনদিন পরিচয় ?

হয় তো কেবলি গাহিয়াছি গান, হয় তো কহিনি কথা,
গানের বাণী সে শুধু কি বিলাস, মিছে তার আকুলতা ?
হৃদয়ে কখন জাগিল জোয়ার, তাহারি প্রতিধ্বনি
কণ্ঠের তটে উঠেছে আমার অহরহ রণরণি'—
উপকুলে ব'সে শুনেছ সে সুর, বোঝ নাই তার মানে ?
বেঁধেনি হৃদয়ে সে সুর, দলেছে দুল হ'য়ে শুধু কানে ?

হায় ভেবে নাহি পাই—
যে চাঁদ জাগালো সাগরে জোয়ার, সেই চাঁদই শোনে নাই।
সাগরের সেই ফুলে' ফুলে' কাঁদা কুলে কুলে নিশিদিন
সুরের আড়ালে মূর্চ্ছনা কাঁদে, শোনে নাই তাহা বীণ্ ?
আমার গানের মালার সুবাস ছুঁলা হৃদয়ে আসি' ?
আমার বুকের বাণী হ'ল শুধু তব কণ্ঠের ফাঁসি ?

বন্ধু গো যেয়ো ভুলে'—
প্রভাতে যে হবে বাসি, সন্ধ্যায় রেখো না সে ফুল তুলে' !
উপবনে তব ফোটে যে গোলাপ—প্রভাতেই তুমি জাগি'
জানি, তার কাছে যাও শুধু তার গন্ধ-সুষমা লাগি'।
যে কাঁটা-লতায় ফুটেছে সে-ফুল, রক্তে ফাটিয়া পড়ি,
সারা জনমের ক্রন্দন যার ফুটিয়াছে শাখা ভরি'—
দেখ' নাই তারে ! —মিলন-মালার ফুল চাহিয়াছ তুমি,
তুমি খেলিয়াছ বাজাইয়া মোর বেদনার ঝুম্‌ঝুমি !

ভোলো মোর গান, কি হবে লইয়া এইটুকু পরিচয়,
আমি শুধু তব কণ্ঠের হার, হৃদয়ের কেহ নয় !
জানায়ো আমারে, যদি আসে দিন, এইটুকু শুধু যাচি—
কণ্ঠ পারায়ে হ'য়েছি তোমার হৃদয়ের কাছাকাছি !

## ৫০.১১ সারাংশ—৩

বিরহবেদনা-ভারাক্রান্ত চিত্তের স্মৃতিচারণামূলক কবিতা এটি। গায়ক কবি তার লেখা গান ও সুর সৃষ্টি একান্ত প্রিয় পাত্রী ও অনুরাগিণীকে শিখিয়ে যে আত্মতৃপ্তি পেয়েছেন, সেই সুখস্মৃতি থেকেই জিজ্ঞাসা—শুধুই কি গান রেখে এসেছেন, অন্তরের অন্তস্থলে ? যে ব্যথা জমা আছে তার কিছুই কি সে পায়নি। হয়তো কোনো কথা হয় নি গানের বাণী শুধু কি মিথ্যা, তার মধ্য দিয়ে উদ্‌বেল হৃদয়ের জোয়ার কি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি। সুরটুকুই সে শুনেছে, তা কি তার হৃদয়কে স্পর্শ করেনি।

যে চাঁদ সাগরে জোয়ার এনেছে, সেই চাঁদ কি সাগরের উদ্‌বেলতা সুরের মূর্ছনা, শুধু কণ্ঠেই স্থান পেয়েছে, হৃদয়ে সাড়া জাগায়নি। গানের মালার সৌরভ পরদিন যা বাসি হয়ে যায়, তাবে তাকে প্রভাতে শুধু সুবাসের জন্য তোলা কেন, বরং চির বিস্মৃতির অতলে তাকে নির্বাসন দেওয়াই ভালো। হৃদয়ে স্থান যদি তা না পায় তা শুধু কণ্ঠের গান হয়ে কী হবে, সে গান ভুলে যাওয়াই ভালো। আর যদি কণ্ঠ থেকে হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছেছেন এমন কোনো দিন আসে তা যেন সে গীতস্রষ্টাকে জানায়।

## ৫০.১২ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

*গানের আড়াল* 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থের (১৩৩৩, ইং ১২ আগস্ট ১৯২৯) একুশটি কবিতার অন্যতম। গ্রন্থটি বিরাট প্রাণ, কবিক দরদী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রকে উৎসর্গ করা হয়েছে। কবি ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে তিন সপ্তাহ সেখানে ছিলেন। সেসময় প্রথমে অতিথি হন মুসলিম হলের হাউস টিউটর অধ্যাপক সৈয়দ আবুল হোসেনের বাসায়, পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের শিক্ষক ও সাহিত্য সমাজের সম্পাদক কাজী মোতাহার হোসেনের বর্ধমান হাউসের বাসায়। সঙ্গীতপ্রিয় সুরসাধক কবি মোতাহারের পাঁচ বছরের মেয়ে অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথের কন্যা উমা (নোটন)-কে অনেক য- করে গান শেখাতেন। ওদিকে টিকাটুলির রেণুকা সেনকে (পরে দাশগুপ্ত) দিলীপ রায় গান শিখিয়ে কয়েকটি রেকর্ড করিয়েছেন। সেগুলি বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। দিলীপ রায়ের কাছে রাণু সোম (পরে বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী প্রতিভা বসু) নজরুলগীতি শেখেন। নজরুল দিলীপ রায়ের কাছে রানুর সংবাদ পেয়ে তিনি ঢাকার বনগ্রামস্থ রাণু সোমের সঙ্গে তাঁদের পৈত্রিক বাড়িতে গিয়ে পরিচয় করেন। বিস্ময়-বিমুগ্ধ রাণু নজরুল ইসলামকে দেখলেন—যাঁর যৌবন তাঁর চোখে মুখে সমস্ত শরীরে নদীর স্রোতের মতো বহমান এবং বেগবান। রাণুর ভাষায় ''আমার মতো একটা নগণ্য সদ্য কিশোরীর জীবনে এক বিরাট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে সেদিন যে প্রচণ্ড সুখ এবং সম্মান এনে দিয়েছিলো তার কোন তুলনা নেই।'' নজরুলও তাঁর স্বাভাবধর্মে সোম-পরিবারকে আপন করে নেন। সংগীত পারদর্শিনী রাণু দুদিনেই নজরুলের প্রিয় ছাত্রী হয়ে উঠলেন। নজরুলের ইচ্ছা রাণু দিলীপ রায়ের ছাত্রী রেণুকার থেকেও বড়ো শিল্পী হয়ে উঠুক। এ সময় তিনি অনেকগুলি গান রচনা ও সুর দিয়ে রাণুকে সমস্ত মন প্রাণ সমর্পণ করে শিখিয়েছেন। গানগুলি হল, 'ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়', 'যাও যাও তুমি ফিরে', 'আঁধার রাতে কে গো একেলা', 'আমি কি সুখে লো গৃহে রব', 'না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়', 'নহিয়া কর পার, কূল নাহি নদী জল সাঁতার' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই গানগুলি 'চোখের চাতক' সংগীত গ্রন্থে সংকলিত ও ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৯ প্রকাশিত হয়। কবি, সুরকার ও সংগীত শিক্ষক নজরুল গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন, 'কল্যাণীয়া বাণী-কণ্ঠী প্রতিভা সোম-কে"। 'গানের আড়াল' কবিতার প্রেক্ষাপটে কবিতা ও গানগুলির রচনার সময় অনুভবের গভীরতা এ দুটির মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা স্মরণ করায়। কবির বক্তব্য গান ও গায়িকার সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্কান্বিত তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার কথা কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন সেটিকেও বিচার করা যেতে পারে। নজরুল জীবনীকার ঘটনাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে নজরুলের ঢাকা সফল বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী ফজিলতুন্নেসার সঙ্গে সম্পর্কের জন্য। ফজিল ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার (বর্তমানে জেলা) করটিয়া গ্রামে ওয়াহেদ আলি খাঁ-র কন্যা। বিদ্যানুরাগী ফজিল নিজ চেষ্টায় অনেক বাধা অতিক্রম করে এ সময় অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর পাঠরত। অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক মোতাহার হোসেনের মাধ্যমে তার সঙ্গে নজরুলের পরিচয়। ফজিল পর্দা মানতেন না, বোরখার ধার ধারতেন না। তিনি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিশতেন। তার মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব ছিল। তার গায়ের রঙ শ্যামলা, কিন্তু চেহারা প্রচণ্ড আকর্ষণীয়, কথাবার্তায় বুদ্ধিদীপ্তির পরিচয় ছিল। নজরুল তার ব্যক্তিত্ব ও মাধুর্যে আকৃষ্ট হন। ফজিলের বেপরোয়া স্বভাব, বুদ্ধিদীপ্তি অসংকোচ ব্যবহার উজ্জ্বল স্বাস্থ্যে মুগ্ধ নজরুল ঘরের কথা ভুলে যান। মাত্র তিনদিনের দেখাসাক্ষাতেই পরস্পর গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ঢাকা থেকে ফেরার পথে পদ্মায় জাহাজে

বসে অধ্যাপক মোতাহার হোসেনকে লেখা একটি চিঠিতে এর আভাস আছে—"আমি বিশ্বাস করি যে, যে আমায় অমন করে চোখের জলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে—সে আমার আজকের নয়, সে আমার জন্মজন্মান্তরের, লোক লোকান্তরের দুখ-জাগানিয়া বন্ধু। তার সাথে নব নব লোকে এই চোখের জলে দেখা এবং ছাড়াছাড়ি।"

ফজিলতুন্নেসার মনেও বিচ্ছেদের দোলা লেগেছিল। তিনিও নজরুলকে একটি চিঠির সঙ্গে 'দুদিনের দেখা' নামে 'গল্প' পাঠিয়েছিলেন 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। এর প্রতিক্রিয়ায় নজরুল মোতাহারকে লেখেন, "বুঝতে পারছিনে—মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে বন্ধু, একজন নারী যে এত নিষ্ঠুর হতে পারে?..."। অপর এক চিঠিতে "আমার ব্যথার রক্তকে রঙীন রঙের ফেনা বলে উপহাস যিনি করেন, তিনি হয়তো দেবতা—আমাদের ব্যথা অশ্রুর বহু ঊর্ধ্বে। কিন্তু আমি মাটির নজরুল হলেও সে দেবতার কাছে অশ্রুর অঞ্জলি আর নিয়ে যাব না।..."

এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি টেনে বলা যায় রাণু সোম ও ফজিলতুন্নেসার ঘটনা একই সময়ের এবং এগুলি য়ে অনেক গল্প কাহিনি থাকলেও, শেষোক্ত ঘটনা বিরহ-বেদনা সাময়িক ভারাক্রান্ত করলেও, তা স্থায়ী ভাবরূপ পায়নি। সুতরাং 'রানুই' এ কবিতার আলম্বন বিভাব বলা যায়।

'চক্রবাক' প্রেমের কবিতার সংকলন। প্রেম আর প্রকৃতি কবির কাব্যের প্রধান উপজীব্য। কবি প্রিয়াকে কখনও দেখেছেন প্রকৃতির মধ্যে কখনও বা প্রকৃতি প্রিয়ার ভাবকল্পনাকে উজ্জীবিত করে। এখানে কবি অতীত স্মৃতিমেদুর মুহূর্তগুলিকে স্মরণ করেছেন। যখন গানের আড়ালে হৃদয়ের আন্তরিক আবেগ গানের কথা ও সুরে কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে লীলায়িত ভঙ্গিতে তরঙ্গোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছে। হৃদয় নিঙড়ানো আবেগকে সংযত ও শিল্পীত ভঙ্গিতে প্রকাশ করে কবি সেই তরঙ্গাবিক্ষেপকে সুন্দরভাবে sublimated বা ঊর্ধ্বায়িত করেছেন।

'গানের আড়াল' কবিতায় বিরহ-মেদুর হৃদয়ের একধরনের রোমান্টিক বিষণ্ণতার ছায়াপাত আছে। কবিতাটি মানবী প্রেমের। সে প্রেমে ব্যক্তি মুখ্য। নারী হৃদয়ের জন্য আকুলতা এর নেপথ্যভূমি। অনুরাগিনী যে নারীকে গান শিখিয়েছেন প্রেমের, তিনি গানটুকু নিলেও প্রেমকে নেননি। তাই কবিকে বলতে শুনি "তোমারর কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি মোর কণ্ঠের গান" এবং একথা বলার পরই শুনি 'অন্তর তলে অন্তরতর যে ব্যথা লুকায়ে রয়"—সেই গানের আড়ালে 'পাও নাই তার কোন পরিচয়!' কবিতার প্রতিটি ছত্রে অনুচ্চারিত পূর্বরাগের বেদনা যেন লীন হয়ে আছে। ফলে কবিতাটি হয়ে উঠেছে একটি বিরহ-ব্যথিত প্রাণের গভীর বেদনার অনুরণন। এতে বেদনার গভীরতা উপলব্ধি করা গেলেও, ক্ষুব্ধ মনের জ্বালা নেই। বরং বলেছেন, 'বন্ধু গো যেয়ো ভুলে'—'প্রভাতে যে হবে বাসি, সন্ধ্যায় রেখো না সে ফুল তুলে।' সুতারং 'ভোলো মোর গান, ....আমি শুধু তব কণ্ঠের হার, হৃদয়ের কেহ নয়।'—এতে ব্যর্থ প্রণয়ের করুণ সুর ধ্বনিত হলেও কোনো অনুযোগ নেই। জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত যেহেতু প্রেমে আশাবাদী, তাই বলেছেন, 'যদি আসে দিন জানায়ো আমারে,' 'কন্ট পারায়ে হয়েছি তোমার হৃদয়ের কাছাকাছি।'

কবি নজরুলের আবেগদীপ্ত হৃদয়ের গভীর অনুভব বারবার নারী হৃদয়কে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমের বিচিত্র রূপ ও স্বরূপ মহিমা তিনি নিত্য নতুন করে কবিতায় গানে তুলে ধরেছেন। অধিকাংশই অপরিপূরিত, কিংবা একপক্ষীয় প্রেম হলেও নারীপ্রকৃতির রহস্যময়তা তাঁর রোমান্টিক কবিহৃদয়কে আকৃষ্ট করেছে। অন্তহীন চলার পথে অন্বেষণ করেছেন পার্থিব প্রিয়ার মধ্যে শাশ্বত নারীকে। গানের আড়াল সেই চলার ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ বিপ্রলব্ধ শৃঙ্গারের কাব্য।

কবিতাটির অবয়ব গঠনে ষণ্মাত্রিক কলাবৃত্ত ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন নজরুল।

*তোমার কণ্ঠে /রাখিয়া এসেছি/মোর কণ্ঠের গান*—৬+৬+৬+২

*এইটুকু শুধু/রবে পরিচয়/আর সব অবসান।*—ছয় ছয় দুই মাত্রার অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত তিনটি পর্ব নিয়ে প্রতিটি ছত্র গঠিত। একে কলাবৃত্ত লঘু ত্রিপদী বলা যায়। প্রথম ও পঞ্চম স্তবক চার ছত্রের, দ্বিতীয় তৃতীয় ছয় ছত্রের এবং চতুর্থ স্তবক আট ছত্রে বিন্যস্ত। নজরুল আবেগ-তাড়িত তাই কবিতা রচনায় ভাবনাসংযম ও শিল্প সচেতনতার অভাব দেখা যায়, তাঁর বেশ কিছু কবিতার গঠন ও শিল্পনির্মিতিতে তীব্র আবেগের কারণেই অনেক সময় কল্পনাশৃঙ্খলার অভাবে অযথা দীর্ঘ ও ভাববাহুল্য দেখা যায়। 'গানের আড়াল' সম্পূর্ণরূপে এ সব দোষ মুক্ত, সংহত শিল্পসৃষ্টি। এর কিছু কিছু শব্দ ও চিত্র নির্মাণে যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় আছে। যেমন—"তোমার কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি মোর কণ্ঠের গান"—এখানে দুবার কণ্ঠ শব্দটি তোমার ও মোর শব্দের সঙ্গে ব্যবহার হওয়ায় প্রণয়াশ্লেষের চিত্ররূপটি ফুটিয়ে তুলেছে। এবং "হৃদয়ে কখন জাগিল জোয়ার, তাহারই প্রতিধ্বনি/ কণ্ঠের তটে উঠেছে আমার অহরহ রণরণি।"—হৃদয়ের (প্রেমের) জোয়ার কণ্ঠের তটরেখায় (বাধা পেয়ে) সুর ও সঙ্গীত সৃষ্টি করে —এখানে সে কথাটি ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন।

*গানের বাণী সে শুধু কি বিলাস, মিছে তার আকুলতা*—কবিতা ও গান কবির অন্তঃপ্রেরণার সৃষ্টি হলেও সে কি শুধুই শিল্প, না-কি কবি জীবনে গভীরতর ভাবানুভূতির পরিচায়ক ? বিশুদ্ধ কাব্যবাদীরা মনে করেন কবিতা সে শুধু কবিতার জন্যই। কিন্তু সমাজ বাস্তবতায় যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁর মনে করেন কবিও সামাজিক মানুষ, তাই কবিতার প্রেরণায় যে-বাস্তব ভিত্তি থাকে তার একটি চিরন্তন রূপই কবিতায় প্রকাশ পায়। গানের পিছনেও যে গভীরতম অন্তবেদনাটি থাকে তাই সুর-তরঙ্গ সৃষ্টি করে আত্মপ্রকাশ করে। গানকে লোকে গ্রহণ করলেও গানের স্রষ্টার ব্যক্তিগত ব্যথাবেদনাকে স্মরণ করে না। কিন্তু কবি মনে করেন গানের বাণী সে শুধু বাণীবিলাস নয়। সেখানে যে আকুলতা ছিল তা গায়কের প্রাণে সাড়া জাগায় নি কি—এই তাঁর ব্যাকুল প্রশ্ন।

*যে চাঁদ জাগালো সাগর জোয়ার, সেই চাঁদই শোনে নাই !*—চাঁদের সঙ্গে সমুদ্র জলের জোয়ার ভাঁটার নিত্য সম্পর্ক — কাব্যে ও বিজ্ঞানে এটি স্বীকৃত। চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্র জোয়ার আসে, কিন্তু চাঁদ কি সেই সাগরের জীবনচাঞ্চল্য, তার ভাবাভিব্যক্তিকে দেখে না ? প্রকৃতির এই রূপচিত্রের মধ্য দিয়ে অন্তরসত্তার এই জাগরণের যে হেতু সেই প্রেরণাদাত্রী কি এটি তার অন্তরে অনুভব করেনি। কবির মনে এই প্রশ্ন প্রকাশ করেছেন।

## অনুশীলনী—৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৭৩ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। অন্যথায় ৫০.১৪ অংশের প্রাসঙ্গিক আলোচনা ইত্যাদি অংশটি ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) অন্তর তবে _____ যে ব্যথা _____ রয়

_____ _____ পাও নাই তার কোনদিন _____ ?

খ) জানায়ে আমারে _____ _____ _____ এইটুকু শুধু যাচি

_____ পারায়ে হয়েছি _____ _____।

২) ‘তোমারে কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি’—উদ্ধৃতিটির অর্থ ও ব্যঞ্জনা বুঝিয়ে দিন।

৩) ‘হয়তো কেবলি গাহিয়াছি গান, হয় তো কহিনি কথা”,—কে কাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলেছেন ?

৪) ‘যে চাঁদ জাগালো সাগর জোয়ার’—উদ্ধৃতিটির অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

৫) ‘ভোলো মোর গান’—কে, কাকে এবং কেন ভুলতে বলেছেন ?

৬) ফজিলতুন্নেসা কে ? সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

## ৫০.১৩ উত্তরমালা

**অনুশীলনী—১**

১) ক) রাজ্যশাসন, সামিল, রাণী, ধুইয়া, রাজ্যের, গ্লানি।

খ) ঘোম্‌টা, শিকল, ঘোম্‌টা, ভীরু, ওড়াও, আবরণ, দাসীর, আভরণ।

২) ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় ‘ধূমকেতু’ কবিতা ও ‘ধূমকেতুর পথ’ সম্পাদকীয়ের জন্য রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

৩) ৫০.২ অংশে ১৯১৭-র সোভিয়েত বিপ্লব প্রসঙ্গ উল্লেখ করবার পর বাংলা কাব্য সাহিত্যে যে নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল, তার কথা বলা হয়েছে।

৪) মরীচিকা (১৯২৩), মরুশিখা (১৯২৭), মরুমায়া (১৯৩০)

৫) ক) মোহিতলাল-এ (খ) সায়ম্ (গ) ভাঙার গান

খ) নজরুল ইসলাম (ঙ) ১৯২২, বিজলী-তে।

৬) ১) জুলাই ১৯২০, পরে ফেব্রুয়ারি ১৯২১ নবযুগ

২) আগস্ট ১৯২২ ধূমকেতু ৩) ১৯২৫, ডিসেম্বর, ‘লাঙল’।

৭) ক) ও খ) এর জন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনার শেষাংশ দেখুন।

**অনুশীলনা—২**

১) ক) উদ্ধত, উলঙ্গ, ক্ষুরধার, শাপে, তরবার।

খ) জন্ম, বেদনার, কাটা-কুঞ্জে, মালিকা, বেদনার, টীকা।

গ) করাঘাত, সারদার, গুণী, আর্তনাদ।

২ থেকে ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা অংশ ভালো করে পড়ুন।

**অনুশীলনী—৩**

১) ক) অন্তর-তর, লুকায়ে, গানের, আড়ালে, কোনদিন।

খ) যদি, আসে, দিন, কণ্ঠ, হৃদয়ের কাছাকাছি।

২ থেকে ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা অংশটি ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর দেওয়া সহজ হবে।

## ৫০.১৪ গ্রন্থপঞ্জী


১) কাজী নজরুল ইসলাম—সঞ্চিতা/সাহারা, সিন্দুহিল্লোল, চক্রবাক।

২) ড. রফিকুল ইসলাম—কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও সাহিত্য।

৩) ড. মিলন দত্ত—নজরুল জীবন-চরিত

৪) অধ্যাপক আতভির রহমান—নজরুল কাব্য-সমীক্ষা।

৫) ড. ক্ষেত্র গুপ্ত—নজরুলের কবিতা ঃ অসংযমের শিল্প।

৬) পশ্চিমবঙ্গ ঃ কাজী নজরুল ইসলাম জন্ম শতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা ১৪০৬।

৭) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ঃ নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মারক-গ্রন্থ।